তিন-আনা-সংস্করণ "কল্পতরু" গ্রন্থাবলী নং ৩৪

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥"

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime."

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
কলিকাতা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ

১৯২৩

মূল্য তিন আনা

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব ইতিহাস—বংশপরিচয়—জন্ম

বাঙ্গলা দেশ বাঙ্গালী জাতির, বাঙ্গালীর ভাষা বাঙ্গলা ভাষা; কিন্তু এই ভাষার আদর দেশে পূর্ব্বে ছিল না—পঞ্চাশ বছর আগেও বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষায় কেহ কিছু লিখিতে পারিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত ভাষাকে ভাঙ্গিয়া পঞ্চাশ বছর আগে ঐ বাঙ্গলা ভাষার সৃষ্টি করিয়া যান। তাহার পর হইতেই বঙ্গবাণীর মন্দিরে ভাষাদেবীর অর্চ্চনা আরম্ভ হয়। কত জন কত পূজার অর্ঘ্য সাজাইয়া এই বাণী-মন্দিরকে আজ পরমসুন্দর ও সমৃদ্ধশালী করিয়া তুলিয়াছেন। কত দীপ জ্বলিয়া স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণে এই বঙ্গবাণীর পবিত্র মন্দির আজ আলোকিত করিতেছে। যাঁর জীবনী আজ আলোচিত হইবে তিনি এই মন্দিরের একটী প্রধান এবং উজ্জ্বলতম দীপস্বরূপ ছিলেন—বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি সাধন করিতে তিনি যেমন ভাবে খাটিয়া গিয়াছেন, যেমন একনিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থপরতার পরিচয় দেখাইয়া গিয়াছেন, তেমন আর কেহ পারিবে না। সেই সরল, একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবকের নাম আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

ত্রিবেদী উপাধি শুনিয়া হয়তো মনে হইতে পারে যে এটা ত বাঙ্গালীর উপাধি নয়। সেটা সত্যি কথা। বাঙ্গলা দেশে ত্রিবেদী উপাধিধারী কেহ ছিল না। ভারত ইতিহাসে শেরশার নাম প্রসিদ্ধ।

সেই শেরশার আমলে বুন্দেলখণ্ড হইতে মানসিংহের সঙ্গে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ বাঙ্গলাদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা আর দেশে ফিরিয়া যান নাই। বাঙ্গলাদেশে থাকিয়া ইঁহারা এখন বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছেন।

ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে বিন্ধ্যপর্ব্বত। সেই পর্ব্বতের গা বহিয়া কত নদী উপনদী চঞ্চলগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড়, সেই পাহাড়ের পদতলে ছোট ছোট হ্রদ; হ্রদের তীরে ঘন বন; বনে কত ফুল, কত পাখী, কত জন্তু। সেই প্রকৃতির কোলে হাজার বছর আগে একটী ব্রাহ্মণজাতি বাস করিত—নাম জিঝোটিয়া। এই জিঝোটিয়া নাম কেমন করিয়া হইল? ইতিহাস পাঠকের নিকট কুমারিল ভট্টের নামও সুপরিচিত। কুমারিল ভট্টের সঙ্গে একদল ব্রাহ্মণ দক্ষিণভারতে যজ্ঞ করিতে আসিয়াছিলেন; তাঁহারা যেখানে বাসস্থান নিরূপণ করিয়াছিলেন তাহার নাম ছিল জিঝৌটি। এই জিঝৌটি হইতেই জিঝোটিয়া নামের উৎপত্তি।

শেরশার অত্যাচারে জিঝোটিয়াগণ দেশত্যাগ করেন। সেই দেশত্যাগীদের মধ্যে একঘর ব্রাহ্মণ মানসিংহের সঙ্গে বাঙ্গলাদেশে চলিয়া আসেন।

আরো পরের কথা, মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গার তীরে টেঁয়া নামে একটী ছোট গ্রাম আছে। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে মনোহর-রাম ত্রিবেদী প্রথম আসিয়া সেই গ্রামে বাস করেন: বাঙ্গলা দেশে তিনিই ত্রিবেদীবংশের আদিপুরুষ। মনোহররামের পুত্রের নাম হৃদয়-রাম, হৃদয়রামের প্রপৌত্র বলভদ্র, বলভদ্রের পুত্র কৃষ্ণসুন্দর, কৃষ্ণ-সুন্দরের পুত্র গোবিন্দসুন্দর এবং এই গোবিন্দসুন্দরের পুত্রের নামই রামেন্দ্রসুন্দর।

বলভদ্র ত্রিবেদী মুর্শিদাবাদ জেলায় জেমোর রাজবাটীতে

বিবাহ করিয়া জেমোতেই বাস করিতে থাকেন। জেমোই রামেন্দ্র-সুন্দরের জন্মভূমি। ১২৭১ সালের ৫ই ভাদ্র শনিবার রামেন্দ্রসুন্দরের জন্ম হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাল্যজীবন—বিদ্যারম্ভ—প্রতিভাবিকাশ

ত্রিবেদী বংশের পূর্ব্বপুরুষেরা বাঙ্গলাদেশে আসিয়া কিছু জমিদারী পাইয়াছিলেন। অন্নচিন্তা দূর হইলে আর কোন চিন্তাই মানুষকে বেশী কাবু করিতে পারে না। সেই জমিদারী পাইয়া তাঁহাদের অন্নচিন্তা দূর হইল, সুতরাং কোন ভাবনা চিন্তাই আর রহিল না, স্বচ্ছন্দে তাঁহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের একমাত্র কাজ হইল জমিদারী দেখাশুনা করা। জমিদারী খুব বড় ছিল না, সুতরাং তাহার কাজ করিয়াও বিস্তর অবসর পাওয়া যাইত। সেই অবসর কালে তাঁহারা লেখাপড়া করিতেন। সেই হেতু এই ত্রিবেদী বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই খুব পণ্ডিত হইতে পারিয়াছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের পিতাপিতামহেরা প্রত্যেকেই এক একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন, কেহ নাটক লিখিয়াছেন, কেহ কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন।

গোবিন্দসুন্দর পুত্রগণের সুশিক্ষার জন্য কখনো কোন ত্রুটি করেন নাই। অতি শৈশবেই রামেন্দ্রসুন্দরের হাতেখড়ি হইল এবং যথাসময়ে বালককে গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ছয় বৎসর। তখন হইতেই তাঁহার আশ্চর্য্য মেধার পরিচয় পাওয়া গেল। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিলেন—দেখা গেল

তিনিই সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। সেই পরীক্ষায় তিনি বৃত্তিলাভ করিলেন।

ইহার পর ইংরাজী শিক্ষার আরম্ভ। গ্রামে কোন উচ্চ বিদ্যালয় ছিল না সুতরাং গ্রাম ছাড়িয়া তাঁহাকে কান্দী আসিয়া ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হইতে হইল। স্কুলের পড়া করিয়াও তিনি অনেক বেশী বই পড়িতেন; সাহিত্য আলোচনা তখন হইতেই কিছু কিছু আরম্ভ করিয়াছিলেন—স্কুলে পড়িবার সময়ই তিনি বাঙ্গলায় কবিতা লিখিতেন। শুধু যে কবিতা লিখিয়া এবং বাজে বই পড়িয়াই তিনি সময় নষ্ট করিতেন তাহা নয়—ক্লাশের পড়াও রীতিমত করিতেন, কর্ত্তব্য কাজে কখনো অবহেলা করিতেন না।

দেখিতে দেখিতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা আসিয়া পড়িল। পরীক্ষার জন্য তিনি একমন একপ্রাণ হইয়া প্রস্তুত হইতে লাগিলেন—পাঠ্য-পুস্তকের ভিতরে তিনি যেন একেবারে ডুবিয়া গেলেন—সংসারের আর কোন চিন্তায় তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিল না। কিন্তু ভগবান অন্তরালে থাকিয়া ঠিক সেই সময় এক বজ্র হানিলেন, পরীক্ষার কয়েকমাস পূর্ব্বে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। পিতৃহীন বালক এই আকস্মিক দুঃখকে বিধাতার আশীর্ব্বাদরূপে গ্রহণ করিলেন। শোকে বিচলিত হইলে ত চলিবে না—এখন যে কর্ত্তব্য সম্মুখে রহিয়াছে—পরীক্ষা আসিয়া পড়িয়াছে—পরীক্ষা যে দিতেই হইবে। সুতরাং দুঃখ-শোকের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া তিনি একাগ্রচিত্তে পড়ায় মন দিলেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। রামেন্দ্রসুন্দর—পিতৃহীন শোকহত রামেন্দ্রসুন্দর—একান্ত সুস্থিরভাবে সেই পরীক্ষা দিয়া আসিলেন। ফল বাহির হইল—সকলে দেখিয়া ত অবাক্! বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনিই কিনা একেবারে সকলের প্রথম স্থান অধিকার করিয়া

বসিয়াছেন ! এবারে তিনি ২০৲ টাকা বৃত্তি পাইলেন। তাঁহার পিতা একজন বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিত লোক ছিলেন। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে পুত্রের এই পরীক্ষার ফল জানিয়া কত না সুখী হইতেন—আপন সন্তানের কৃতিত্বে কত না গৌরব অনুভব করিতেন ; কিন্তু ভগবানের ইচ্ছার উপরে কাহারো হাত নাই, তাই পিতার আশা আর পূর্ণ হইল না।

রামেন্দ্রসুন্দর যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন তখন তাঁহার বয়স আঠার বৎসর। চৌদ্দ বৎসর বয়সে, যখন তিনি স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীতে পড়িতেন, তখনই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার স্ত্রীর নাম শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা দেবী। এই ইন্দুপ্রভা জেমোর রাজা নরেন্দ্র-নারায়ণের কনিষ্ঠা কন্যা। বিবাহের সময় ইঁহার বয়স ছিল মাত্র সাত বৎসর।

রামেন্দ্রসুন্দরের পিতা গোবিন্দসুন্দর একজন পণ্ডিত ছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তিনি যে কি রকম পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার চরিত্রের কোন্ অংশটুকু রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছিল তাহাই এখানে বর্ণিত হইতেছে। গোবিন্দসুন্দর টোলের পণ্ডিত ছিলেন না—তিনি ছিলেন একজন কাব্যামোদী সাহিত্য-রসিক। "বঙ্গবালা" নামে তিনি একখানা উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। সেই উপ-ন্যাসের ভূমিকাটি লিখিয়াছিলেন কবিতায়—পয়ার ছন্দে। দেশাত্মবোধ যে তাঁহার কি রকম ছিল সেই ভূমিকাটি পড়িলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। এখানে প্রথম চারিটি লাইন উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"বাঙ্গালীর রণবাদ্য বাজে না বাজে না !
বঙ্গদেশে নাহি হয় সমর ঘোষণা ॥
রণক্ষেত্রে বীরমদে মত্ত হতজ্ঞান।
হয় নাই বহুদিন বাঙ্গালী সন্তান ॥"

রামেন্দ্রসুন্দরের পিতা জেমোয় একটি থিয়েটারও করিয়াছিলেন এবং অনেক খরচ করিয়া তাহার সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শুধু সাজসরঞ্জাম ও থিয়েটার ঘর করিলেই ত আর কাজ শেষ হইল না—অভিনয়ও করা চাই। গোবিন্দসুন্দরের যেমনি অদম্য উৎসাহ, তেমনি আশ্চর্য্য পাণ্ডিত্যও ছিল। তিনি নিজেই "দ্রৌপদানিগ্রহ" নামে একখানা নাটক লিখিয়া ফেলিলেন এবং কিছুদিনের মধ্যে সেখানার অভিনয়ও হইয়া গেল।

শুধু যে রামেন্দ্রসুন্দরের পিতাই সাহিত্য-রসিক ছিলেন তাহা নয়। তাঁহার পিতামহ ব্রজসুন্দরও একজন কাব্যামোদী লোক ছিলেন। তিনি 'মাধব-সুলোচনা' নামে একখানি গদ্যপদ্যময় নাটক ও 'গৌরলাল-সিংহ' নামে একখানি প্রহসন বাঙ্গলায় রচনা করিয়াছিলেন।

এরূপ কাব্যামোদী পরিবারে যার জন্ম হয় এবং বাল্যকাল যার কাব্যচর্চ্চা ও আমোদ আহ্লাদে অতিবাহিত হয়, সে কি একজন কাব্যরসিক না হইয়া থাকিতে পারে? আমাদের রামেন্দ্রসুন্দরও তাই কাজে, কথায় ও লেখায়, সকল বিষয়েই একজন একান্ত সরল সাহিত্যিক ছিলেন, তাঁর সব কিছুতেই যেন কাব্য মাখান ছিল। রামেন্দ্রসুন্দরের খুল্লতাত উপেন্দ্রসুন্দরও একজন সাহিত্যানুরাগী ছিলেন, সংস্কৃত শ্লোক রচনায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। এই উপেন্দ্র-সুন্দরের সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। কলিকাতা আসিয়া তাঁহার মন সাহিত্যরসে একেবারে ডুবিয়া গেল। কলেজে তিনি এফ্ এ পড়িতেন, কিন্তু পাঠ্যপুস্তকে তাঁহার মন যেন বসিত না, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বই পড়িয়া তিনি তৃপ্তি পাইতেন না; তাই কলেজের বই পড়িয়াও ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাস পাঠেই তিনি অধিক সময় ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঠে তেমন মনোযোগ না দিয়াও ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এফ্ এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি দ্বিতীয়

স্থান অধিকার করিলেন এবং ২৫৲ টাকা বৃত্তি ও সুবর্ণপদক পুরস্কার লাভ করিলেন। পাঠে মনোযোগ না দিয়াই যিনি এরকম ফল দেখাইলেন, রীতিমত পড়াশুনা করিয়া পরীক্ষা দিলে যে তিনি কি রকম কৃতিত্বই দেখাইতে পারিতেন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

এই সময় তিনি দ্বিতীয়বার শোকের আঘাত পান। ১২৯১ সালের কার্ত্তিকমাসে তাঁহার পিতৃব্য উপেন্দ্রসুন্দর পরলোকে গমন করেন।

রামেন্দ্রসুন্দর যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে বি. এ. পড়িতেন তখন স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রায় সুরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, প্রফেসর কে, ডি, মল্লিক প্রভৃতি তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। বি, এ পড়িবার সময় তিনি বাঙ্গলা ভাষায় প্রবন্ধ লিখিয়া বেনামীতে 'নবজীবন' পত্রিকায় পাঠাইয়াছিলেন। 'নবজীবনে'র সম্পাদক স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার সেই প্রবন্ধ পড়িয়া উহার লেখক যে কে তাহা তিনি আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন এবং রামেন্দ্রসুন্দরকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

এই সময়ে তাঁহার বিজ্ঞান পড়িতে অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিল। বিজ্ঞানের বই অধ্যয়নে তিনি এমন ভাবে মনোযোগ দিলেন যে, কোথায় গেল তাঁর ইংরাজী সাহিত্য পাঠ আর কোথায় গেল তাঁর ইতিহাস চর্চ্চা! বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সে সব পড়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে হইল। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিজ্ঞানে বি, এ পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষাতে যে শুধু অনার পাইলেন তাহা নয়, একেবারে প্রথমস্থান অধিকার করিয়া ৪০৲ টাকা বৃত্তিলাভ করিলেন। পর বৎসর পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন-শাস্ত্রে এম, এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। রসায়নের অধ্যাপক পেড্‌লার সাহেব তাঁহার একটী 'ক্লাস এক্সারসাইজ' দেখিয়া এমন সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে ডাকিয়া নিয়া 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' বৃত্তি পরীক্ষা দিবার জন্য উৎসাহিত করিয়া তুলেন। তখন তিনি

এম্ এ ক্লাসের ছাত্র, ক্লাসে তাঁহার সমকক্ষ দ্বিতীয় আর কেহ ছিল না। পেড্‌লার সাহেব বি, এ পরীক্ষায় রসায়নশাস্ত্রের পরীক্ষক ছিলেন। তিনি রামেন্দ্রসুন্দরের রসায়নের কাগজ পরীক্ষা করিয়া এত সন্তুষ্ট ও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন যে, একদিন এম্ এ ক্লাসে সকলের সম্মুখে তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন—"আমি এ পর্য্যন্ত যত রসায়নের কাগজ দেখিয়াছি, তন্মধ্যে ঐ 'Out and out the best.'"একটু থামিয়া তিনি আবার বলিয়া উঠিলেন—"Out and out the best" (অর্থাৎ ইহা সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) সেই দিন ক্লাসে অধ্যাপকের নিকট ঐ রকম উৎসাহ পাইয়া তিনি 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' বৃত্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিলেন।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এম্ এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া একটী সুবর্ণপদক এবং একশত টাকার পুস্তক পুরস্কার-স্বরূপ লাভ করেন। ইহার পর বৎসরই, ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি লাভ করিলেন। পরীক্ষায় তিনি যে উত্তর লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহা এমন চমৎকার হইয়াছিল যে, একেবারে অতুলনীয়। পরীক্ষকেরা তাঁহার লিখিত কাগজ পড়িয়া একবাক্যে বলিয়াছিলেন যে "প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষায় এ পর্য্যন্ত যে সকল ছাত্র ফিজিক্স ও কেমিষ্ট্রী লইয়াছেন, এই ছাত্রই তাঁহাদের মধ্যে বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"

এই খানেই তাঁহার ছাত্রজীবনের শেষ এবং কর্ম্মজীবন আরম্ভ হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কর্ম্মজীবন—অধ্যক্ষতা

রামেন্দ্রসুন্দরের জন্ম উচ্চবংশে। উচ্চবংশেরই তুল্য ছিল তাঁর চরিত্র। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রে অহঙ্কার ছিল না, হিংসা দ্বেষ ছিল না, পরশ্রী-কাতরতা ছিল না, ধনে লিপ্সা ছিল না, সম্মানলিপ্সাও ছিল না। তাঁহার হৃদয় ছিল উদার নির্ভীক, অন্তর ছিল কর্ম্মপ্রবণ ও বৈরাগ্যময়। তাঁহার প্রাণে ছিল একনিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রীতি। তিনি ছিলেন একজন সদানন্দপুরুষ—মুখে তাঁর মধুর হাসি সকল সময়েই লাগা থাকিত। তাঁহার প্রতিভা ছিল সর্ব্বতোমুখী। বিজ্ঞানে, দর্শনে, সাহিত্যে এই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই প্রতিভা, এই নির্ম্মল আদর্শ চরিত্র সবই নির্ভর করে বিদ্যার উপর। সেই বিদ্যা তিনি নিজের চেষ্টায় অর্জ্জন করিয়াছিলেন। নিজে চেষ্টা করিয়া যদি পরীক্ষায় ভাল পাশ না করিতেন তবে কে তাঁহাকে আজ চিনিতে পারিত? কাঁদি স্কুল হইতে ত কত শত ছেলেই পাশ করিয়া আসিতেছে, কলেজ হইতেও ডিগ্রী লইয়া বাহির হইতেছে, কিন্তু কে তাহাদের খবর রাখে? তিনি ইচ্ছা করিলে কলিকাতায় বসিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াও রাখিয়া যাইতে পারিতেন কিন্তু তিনি তা করেন নাই। লক্ষ্মীর উপাসনা না করিয়া করিয়াছেন সরস্বতীর আরাধনা। সাহিত্যের জন্য, বাঙ্গলা ভাষার জন্য আজীবন নিঃস্বার্থ-ভাবে তিনি খাটিয়া জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন।

"প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ" বৃত্তি পরীক্ষাই তাঁহার ছাত্রজীবনের শেষ পরীক্ষা। এই পরীক্ষার পর তিনি দুই বৎসর প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞানাগারে বিজ্ঞান চর্চ্চা করেন। পরীক্ষাজীবন শেষ হইয়াছিল বটে,

কিন্তু ছাত্রজীবন তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই। পুস্তক পাঠ ও বিদ্যা চর্চ্চা তিনি আজীবন করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য তাঁহার প্রাণে একটা অনন্ত পিপাসা যেন লাগিয়াই ছিল। সেই পিপাসা, সেই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি জন্য চিরজীবন কেবল বইই পড়িয়া গিয়াছেন। তিনি যখন যাহা পড়িতেন—তন্ময় হইয়া পড়িতেন, পড়িয়া একেবারে হজম করিয়া ছাড়িতেন। তাই তাঁহার সোণার লেখনী অতি কঠিন ও নীরস বিষয়কেও সরল ও সরস করিয়া তুলিতে পারিত।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এণ্ট্রান্সের পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে রিপণ কলেজে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া এক বৎসর কাজ করেন। পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ পদ অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে উল্লেখযোগ্য তেমন বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই। তিনি লোকচক্ষুর আড়ালে নির্জ্জনে থাকিয়া শুধু কাজই করিয়া গিয়াছেন।

কলেজ হইতে বাহির হইয়া রিপণ কলেজে অধ্যাপকরূপে ঢুকিবার পূর্ব্বে তাঁহার গভর্ণমেণ্টের চাকুরী পাইবার একটা সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পাইয়া তিনি গভর্ণমেণ্টের এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টে চাকুরীর জন্য ডিরেক্টারের নিকট এক আবেদন করিয়াছিলেন। সেই আবেদন পাইয়া ডিরেক্টার সাহেব তাঁহাকে তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠান। ত্রিবেদী মহাশয় যথাসময়ে ডিরেক্টারের আফিসে যাইয়া উপস্থিত হন এবং চাপ্‌রাশীর দ্বারা তাঁহার নামলেখা কার্ড সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। যেমন দস্তুর—চাপ্‌রাশী কার্ডখানা হাতে লইয়া বলে—'মশাই, বখ্‌শিস্‌?' ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত রাগ ও ঘৃণা জন্মিয়া গেল। ডিরেক্টারের নিকট কার্ড লইয়া যাইবে—চাপ্‌রাশীর ত উহাই কর্ত্তব্য কাজ, আর সে কি না

আগে ভাগেই চাহিয়া বসিল বখ্‌শিস্‌। রামেন্দ্রসুন্দর ভাবিলেন—এই ত গভর্ণমেণ্টের চাকুরী! ইহার গোড়াতেই যে নমুনা, পরে না জানি আরো কত রকম সেলামী গোলামীরই পরিচয় পাওয়া যাইবে। কাজ নাই এমন চাকুরীর—যদি প্রকৃত গুণের আদর কেহ করিতে চায়, তবে ঢের কাজ মিলিবে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই আফিস্‌ হইতে হন্‌ হন্‌ করিয়া চলিয়া আসিলেন, ডিরেক্টার সাহেবের সাথে আর দেখাই করিলেন না। কি তেজ, কি সত্যনিষ্ঠা! অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া তাঁহার স্বভাব ছিল না। অসত্য এবং অসদাচরণকে তিনি দুচক্ষে দেখিতে পারিতেন না, প্রাণ দিয়া ঘৃণা করিতেন। এই যে চরিত্র—ন্যায়বান পুরুষচরিত্র, ইহা তিনি তাঁহার উচ্চবংশ হইতেই পাইয়াছিলেন। কিন্তু কোনও প্রকার তোষামোদ কিম্বা অনুরোধ উপরোধ করা তিনি একদম পছন্দ করিতেন না। তিনি ছিলেন সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ সাধক। সেই সাধনাতেই তিনি জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন, সেই সাহিত্যসাধনার নিকট নিজের সুখ সুবিধা, স্বাস্থ্য স্বার্থ সকলি বলিদান করিয়া গিয়াছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর রিপণ কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ার পর হইতেই রিপণ কলেজের শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হয়। তাঁহারই চেষ্টা ও পরিচালনগুণে রিপণ কলেজ আজ উন্নতির শীর্ষ সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

তাঁহার কর্ম্মজীবনের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই বলিতে হয় তাঁহার সাহিত্যসাধনার কথা। সাহিত্যক্ষেত্রেই তিনি অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন—সাহিত্যের কথা বাদ দিলে আগাগোড়া মানুষটিকেই যে বাদ দিতে হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কর্ম্মজীবন—সাহিত্যসাধনা

রামেন্দ্রসুন্দর অদ্ভুত শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য, তাঁহার চিন্তাশীলতা অতি অসাধারণ ছিল। বাল্যকালে যখন তিনি ইংরাজী স্কুলে পড়িতেন তখন হইতেই তাঁহার সাহিত্য চর্চ্চার চেষ্টা আরম্ভ হয়। লুকাইয়া লুকাইয়া তিনি তখন হইতেই কবিতা লিখিতেন। 'ছাত্রবৃত্তি' দিবার পূর্ব্বে সকলের অজ্ঞাতসারে তিনি বঙ্গদর্শন পড়িতেন। তারপর যখন তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর তিনি তখন এম, এ ক্লাসের ছাত্র, সেই সময় নবজীবন পত্রিকায় তাঁহার এক প্রবন্ধ বাহির হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যে এই তাঁহার প্রথম হাতেখড়ি। উৎসাহ পাইয়া তখন হইতেই তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। কলিকাতার ঠাকুরবাড়ী হইতে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তখন সাধনা পত্রিকা বাহির করিতেছিলেন। সেই সাধনাতে রামেন্দ্র বাবু ধারাবাহিক রূপে অনেক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাষা—সে এক অদ্ভুত জিনিষ! প্রথম প্রথম তিনি কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের ভাষার খুব ভক্ত ছিলেন, তাঁহার ধারণা ছিল যে ঐ রকম গম্‌গমে ভাষায় না লিখিলে বুঝি মনের ভাব ভাল করিয়া প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু প্রতিভা বেশী দিন চাপা থাকে না। তাঁহার নিজের যে অদ্ভুত শক্তি তাহা বিকশিত না হইয়া কতদিন আর ভিতরে লুকান থাকিবে? তিনি ঠিক করিলেন—তাঁহার যা কিছু বক্তব্য তাহা বলিবার জন্য উপযুক্ত একটা ভাষা গড়িয়া তুলিতে হইবে।

বাঙ্গলা ভাষা তাঁহার অতি প্রিয় বস্তু ছিল। বাঙ্গালীর সাহিত্য তাঁহার সাধনার সামগ্রী ছিল— সেই সাধনায় তিনি সিদ্ধি লাভ করিয়া

গিয়াছেন। তিনি যে ভাষা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহা এক বিস্ময়কর জিনিষ। তাঁহার ভাষা জলের মত সরল, অমৃতের মত সরস ও মধুর সৌন্দর্য্যে সে ভাষা অতুলনীয়। তিনি যে সকল রচনা লিখিয়া গিয়াছেন সে গুলিতে তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার ভাষাই যে শুধু সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ছিল তাহা নয়, তাঁহার সেই সব নিপুণ রচনার ভিতর তাঁহার অদ্ভুত বিশ্লেষণ শক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। অত্যন্ত দুরূহ বিজ্ঞান ও দর্শনের জটিল তত্ত্বগুলি তিনি যে রকম বিষদভাবে জলের মত করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই সকলের বিস্ময় উৎপাদন করে।

দর্শন বিজ্ঞান চিরকালই অতি কঠিন ও দুর্ব্বোধ্য। সাধারণে তাহার রস উপভোগ কোন দিনই করিতে পারে না। কিন্তু ত্রিবেদী মহাশয় একজন সাহিত্যিক হইয়াও অপূর্ব্ব প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ছিলেন। তাঁহার রচিত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পুস্তকগুলি এমনি সরস ও সুখপাঠ্য যে আজ সেগুলি বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে অমৃতরস বিতরণ করিতেছে। এই অদ্ভুত প্রতিভার অধিকারী রামেন্দ্রসুন্দরকে তাই বলা হইয়াছে—'দর্শনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী ও সাহিত্যের যমুনা'। বাস্তবিকই ত্রিবেদী মহাশয়ের ভিতর আমরা মানবচিন্তার ত্রিবেণী-সঙ্গম দেখিতে পাই। তিনি বলিতেন -বাঙ্গালী যদি উন্নতি লাভ করিতে চায় তবে তাহাকে বাঙ্গলা ভাষার সাহায্যে—তাহার মাতৃভাষার সাহায্যেই করিতে হইবে। রিপণ কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াও তিনি কোন দিন ক্লাসে ইংরাজীতে কথা বলিতেন না, ছাত্রদিগকে বাঙ্গলা ভাষায়ই পড়াইতেন। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও তিনি ইংরাজী ভাবাপন্ন হইয়া যান নাই। তাঁহার শিক্ষা ছিল বিদেশী কিন্তু অন্তরে অন্তরে তিনি একজন খাঁটি স্বদেশী ছিলেন। বিদেশের জ্ঞানে বিজ্ঞানে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াও স্বদেশের শিক্ষা ও সভ্যতাকে তিনি অবহেলা করিতেন না। স্বাদেশিকতার

ভাবে তাঁহার প্রাণ মন ভরপূর ছিল। কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়াও তিনি বাঙ্গালীর ধুতি চাদর পরিয়াই কলেজে যাইতেন। হ্যাট্ কোট নেক্‌টাই লাগাইয়া তিনি কখনো সাহেব সাজেন নাই। সাহেবী চালচলনকে তিনি প্রাণদিয়া ঘৃণা করিতেন। প্রত্যেক কলেজেই প্রিন্সিপালের জন্য পৃথক্ একটী খাস্‌কামরা থাকে। রিপণ কলেজে তাহা ছিল না। সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্স্‌পেক্টারগণ অনেকবার অনেক কৈফিয়ৎ চাহিয়া ত্রিবেদী মহাশয়কে অস্থির করিয়া তুলিয়াছেন। ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন—"আমি এতগুলি লোক ছাড়িয়া একা একঘরে কেমন করিয়া থাকিব? আমার ইচ্ছা সবাই একসঙ্গে বসি, আলাপ করি। তাই আমার নিজের জন্য কোন পৃথক্ কামরার আবশ্যক আছে বলিয়া মনে করি না।"

তিনি সকলের সঙ্গে সমান ভাবে মিশিতেন। অধ্যাপক ও অধ্যক্ষের ভিতরে কোন পার্থক্য থাকে তাহা তিনি পছন্দ করিতেন না। কলেজ ছুটীর পর প্রত্যহ তিনি সকল অধ্যাপকদের লইয়া নানাবিষয়ে আলাপ আলোচনা করিতেন। প্রত্যেককে বাঙ্গলা পড়িতে, বাঙ্গলা লিখিতে, সাহিত্য চর্চ্চা করিতে উপদেশ ও উৎসাহ দান করিতেন। এই জন্য তিনি রিপণ কলেজে একটী অধ্যাপকসঙ্ঘ (Professors' Union) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ছিল—সাহিত্য চর্চ্চা ও পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করা। কোন অধ্যাপক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন—ঐ সঙ্ঘে উহা পড়িয়া শুনাইতে হইবে। তিনি নিজেও মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখিয়া ঐ সঙ্ঘে পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইয়াছেন। প্রবন্ধ লিখিতে পারে কিম্বা সাহিত্যে বেশ একটু অনুরাগ আছে এমন কোন কোন ছাত্রদিগকেও সেই সঙ্ঘে ডাকিয়া লওয়া হইত। প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা শেষ হইলে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন-জলযোগ দ্বারা সকলকে আপ্যায়িত করিয়া সভা ভঙ্গ করা হইত।

'রিপণ-কলেজ পত্রিকা' তাঁহার একটী আদরের জিনিষ ছিল। তাঁহার উৎসাহ এবং নেতৃত্বেই উহা প্রকাশিত হয়।

কলেজের লাইব্রেরীর জন্য যখন নূতন বই কিনিতে হইত তখন তিনি শুধু নিজের রুচি অনুসারেই বই কিনিতেন না—সকলে যাহা চায় তিনি সেই ভাবেই গ্রন্থনির্ব্বাচন করিতেন। অনেক সময় নিজে পাঠ না করিলেও নূতন কোন কাব্য নাটক বাহির হইলে যে অধ্যাপক উহা পাঠ করিয়াছেন তাঁহার নিকট উহার সারমর্ম্ম শুনিয়া লইতেন। তিনি যে বিষয়ে যখন আলোচনা করিতেন তখন ঐ সম্বন্ধে কোন নূতন পুস্তক বাহির হইলে তৎক্ষণাৎ উহা ক্রয় করিয়া আনিয়া পড়িয়া ফেলিতেন। তাঁহার পড়িবার আগ্রহ ছিল চিরনবীন, জ্ঞানলাভের স্পৃহা ছিল অশেষ।

বাঙ্গলা দেশের প্রায় অধিকাংশ ভাল মাসিক পত্রিকাতেই তিনি বহু সুচিন্তিত ও সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। 'নবজীবনে' তাঁহার হাতে-খড়ি হইয়াছিল কিন্তু পরে 'সাধনা', 'জন্মভূমি', 'দাসী', 'সাহিত্য', 'বঙ্গদর্শন' (নবপর্য্যায়), 'মানসী', 'ভারতী', 'আর্য্যাবর্ত্ত', 'ভারতবর্ষ', 'উপাসনা', 'মুকুল', 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', 'প্রবাসী' প্রভৃতি সকল পত্রিকাতেই তাঁহার মূল্যবান রচনা বাহির হইয়াছে। সেই সমস্ত প্রবন্ধ হইতে কিছু কিছু সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার-লেখা পুস্তকাবলির একটী তালিকা এখানে দিতেছি।—

১। প্রকৃতি ২। মায়াপুরী ৩। জিজ্ঞাসা ৪। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৫। বিজ্ঞান পাঠ ৬। ভূগোল ৭। চরিত কথা ৮। কর্ম্মকথা ৯। শব্দকথা ১০। জগৎকথা ১১। বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা ১২। যজ্ঞকথা ১৩। বিচিত্র জগৎ

ইহা ছাড়া আরো একখানা বই প্রকাশিত হইয়াছে যাহা তিনি লিখেন নাই বটে কিন্তু মুখে শুধু বলিয়া গিয়াছেন ও একজনে সেই কথা গুলি লিখিয়া লইয়াছেন। সেই পুস্তকের নাম "বিচিত্র প্রসঙ্গ"।

তিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন সকলি বাঙ্গলা ভাষায়ই লিখিয়াছেন। বাঙ্গলা ভাষার অবমাননা তিনি কখনো করেন নাই—বাঙ্গলা ভাষার মর্য্যাদা যাহাতে বর্দ্ধিত হয় সেই চেষ্টাই তিনি চিরকাল করিয়াছেন। দুইবার তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপদেশকরূপে প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, দুইবারই তিনি সেই নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। কেন দিয়াছিলেন? তিনি বলিয়াছিলেন বাঙ্গলা ভাষায় যদি প্রবন্ধ পড়িতে দেওয়া হয় তবে তিনি ঐ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে রাজী আছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি ইংরাজীতে পাঠ করা, ইংরাজীতে বক্তৃতা দেওয়া। সুতরাং রামেন্দ্রসুন্দর প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে বাঙ্গলা ভাষায় প্রবন্ধ পড়িবার অনুমতি পাইলেন না। তাঁহাকে আবার অনুরোধ করা হইল। এবার তিনি বিনীতভাবে লিখিয়া দিলেন—"ইংরাজী রচনায় আমি নিতান্ত কাঁচা। বাঙ্গালী মানুষ বাঙ্গলাতেই আমি লিখিয়া থাকি—ইংরাজী লেখার আমার অভ্যাস নাই। অনুমতি পাইলে বাঙ্গলা ভাষায় 'বেদ' সম্বন্ধে আমি আমার প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারি।" তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার ছিলেন স্যর ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। তিনি তখন ত্রিবেদী মহাশয়কে বাঙ্গলা ভাষাতেই প্রবন্ধ পড়িবার অনুমতি দিলেন। তাঁহার সেই প্রবন্ধগুলি 'যজ্ঞকথা' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

রামেন্দ্রসুন্দর কবি রবীন্দ্র নাথের একজন পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত গদ্যপদ্য সকলি তিনি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন এবং সাহিত্যরসের আস্বাদন পাইয়া আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত রামেন্দ্রসুন্দরের ভাবের আদান প্রদান মৃত্যুর পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত সমান ভাবে চলিয়াছিল। অনেক বিষয়েই তিনি কবিবরের সহিত একমত হইতে পারেন নাই কিন্তু তবু একদিনের জন্যও তাঁহাদের মধ্যে মনোমালিন্য কিম্বা বিচ্ছেদ ঘটিবার কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই।

আমরণ তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময়কার কথা,—লর্ড কার্জ্জন সাহেব বাঙ্গলা দেশকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দিলেন। দেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। দেশের জন্য সকলের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কি করিয়া সেই ভাঙ্গা বাঙ্গলাকে আবার জোড়া লাগান যায় তাহার জন্য কত সভা, কত বক্তৃতা, কত হৈ রৈ আরম্ভ হইয়া গেল। 'রাখীবন্ধন' ও 'অরন্ধন' প্রথার সৃষ্টি তখনকার। কিন্তু কাহার মাথা হইতে প্রথম এই দুটী প্রথার কল্পনা বাহির হইয়াছিল? একটী বাহির হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথের মাথা হইতে ও অপরটী বাহির হইয়াছিল রামেন্দ্রসুন্দরের মাথা হইতে।

সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক গান লিখিয়াছিলেন। একটী নূতন গান লিখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা রামেন্দ্রসুন্দরকে শুনাইবার জন্য রবিবাবু তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিতেন। রবীন্দ্রনাথের উত্তেজনাতেই রামেন্দ্রসুন্দর সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময় 'বঙ্গলক্ষ্মীর' ব্রতকথা লিখিয়াছিলেন।

রামেন্দ্রবাবু কায়-মন-বাক্যে একেবারে খাঁটি বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছিলেন। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে তিনি যে রকম সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন, ইচ্ছা করিলেই তাঁহার গবেষণা ও চিন্তা-প্রসূত বিষয়গুলি ইংরাজীতে লিখিয়া স্বদেশে এবং বিদেশে সকলখানেই প্রভূত যশঃ ও সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার মন ছিল অন্যরকম। তাঁহার সাধনা ছিল মাতৃভাষার সেবা ও উন্নতি করা। 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ও তদ্দ্বারা স্বজাতির যথাসাধ্য সেবা করিয়া জীবন শেষ করা'—ইহাই ছিল তাঁহার প্রার্থনা। এই ভাবটুকু তাঁহার ভিতর ছাত্রাবস্থাতেই জন্মিয়াছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে সবেমাত্র পাশ করিয়া বাহির হইয়াছেন—তখনো কোন চাকরীতে স্থায়ীরূপে বহাল হন নাই। কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেব তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন—

"একটা চাকুরী আছে। মহীশূর রাজ্যে বাঙ্গালোরে যাও ত চাকরীটা পাইতে পার। সেখানকার কলেজের প্রিন্সিপাল ছুটী লইয়া বিলাত যাইতেছেন—হয়তো আর নাও ফিরিতে পারেন। তুমি গেলে হয়তো পাকা (Permanent) হইয়া যাইতেও পার। সেখানে কলেজের কাজ করিবে, মানমন্দির (Observatory) আছে তারও তত্ত্বাবধান করিবে। তুমি যাও, কাজটী গ্রহণ কর।" কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের মন বাঙ্গলাদেশ ছাড়িয়া যাইতে রাজী হইল না। রিপণ কলেজে চাকরী পাইয়া তিনি বাঙ্গলাদেশেই রহিয়া গেলেন। বাঙ্গলাদেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলে তাঁহার সাহিত্য-সাধনা ফলবতী হইত না। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় বাঙ্গলা ভাষার আজ যে সম্মান ও গৌরব সাধিত হইয়াছে তাহা অন্যের দ্বারা হইতে পারিত না। তিনি বলিয়াছেন—বাঙ্গলা দেশের আর কিছু থাক আর না-ই থাক, পুরাতন সাহিত্য আছে, সেই সাহিত্য বাঙ্গালীর অগৌরবের বিষয় নহে, এমন কি সেই সাহিত্যই বাঙ্গালীর পক্ষে একমাত্র গৌরবের ধন। তিনি দেশের বৈজ্ঞানিকগণকে তাঁহাদের গবেষণার ফল মাতৃ-ভাষায় লিখিয়া মাতৃভাষাকে গৌরবান্বিত করিতে, মাতৃভাষাকে নানা শাস্ত্রে অলঙ্কৃত ও সম্পদ্‌শালিনী করিয়া তুলিতে বারবার অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গলা সাহিত্যের জন্য তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহা অনুকরণীয়, বাঙ্গলা ভাষাকে তাঁহার জ্ঞানময় প্রবন্ধাবলীতে যে সম্পদ দান করিয়া গিয়াছেন সেজন্য বাঙ্গালী মাত্রই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ—এই ঋণ বাঙ্গালীর পক্ষে অপরিশোধনীয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কর্ম্মজীবন—সাহিত্যপরিষদ্ মন্দির—সাহিত্যসম্মিলন

রামেন্দ্রসুন্দরকে না পাইলে সাহিত্য-পরিষৎ আজ কি অবস্থায় থাকিত কে জানে। সাহিত্য-পরিষৎ যেমন রামেন্দ্রসুন্দর ছাড়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না তেমনি সাহিত্য-পরিষদের কথা না বলিলে রামেন্দ্র-জীবনও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

১৩০১ সালের ১৭ই বৈশাখ Bengal Academy of Literature নামক সভাকে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ নামে অভিহিত করা হয়। প্রথম হইতেই ইহার সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের সংশ্রব ঘটে। প্রথম বৎসরই কিছুদিনের জন্য তিনি উহার সম্পাদক পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

প্রথম এই পরিষদ্ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের প্রাসাদে ছিল। তারপর ১৩০৬ খ্রীষ্টাব্দে উহা সেখান হইতে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে উঠিয়া আসে। তখন হইতেই পরিষদ্‌কে তাহার নিজ ভবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রামেন্দ্রসুন্দরের একান্ত ইচ্ছা জন্মে। তিনি তাঁহার সহযোগী ও সহকর্ম্মী ব্যোমকেশ মুস্তফীকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ভিক্ষার ঝুলি মাথায় লইয়া বাহির হইয়া পড়েন। কাশীম বাজারের মহারাজা স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ভূমিদান করেন। ১৩১৫ সালের ২১শে অগ্রহায়ণ ঐ ভূমিতে সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দির-প্রবেশের দিন সেই মন্দিরে বসিয়া কবি গাহিয়াছিলেন——

"জননী বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি অমল কমল চরণে স্থান।"

সেই ভাষাজননীর চরণ সেবা করিয়াই রামেন্দ্রসুন্দরের জীবন কাটিয়াছে। এমন নিঃস্বার্থ, নিরহঙ্কার সাহিত্য-সেবক সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

১৩০১ সালে পরিষদের গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দরই এই গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি যেমন ছিল সর্ব্বতোমুখী, তাঁহার দৃষ্টিও ছিল তেমনি সর্ব্বদিকে। গ্রন্থাগার স্থাপিত হইলে পর মুদ্রিত ও হস্তলিখিত বহু প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনা হইতে লাগিল। অনেকে অনেক পুস্তক দান করিতে লাগিলেন, অর্থ-সাহায্যও করিতে লাগিলেন। ত্রিবেদী মহাশয় উৎসাহী লোক। তিনি লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরকে ধরিয়া বসিলেন। যোগীন্দ্রনারায়ণ অর্থশালী ধনাঢ্য ব্যক্তি—তদুপরি তিনি একজন বিদ্যোৎসাহী পুরুষ। ত্রিবেদী মহাশয়ের চেষ্টা, উদ্যোগ ও উৎসাহে যোগীন্দ্রনারায়ণ পরিষদের বিবিধ ভাণ্ডারে ৭০,০০০৲ টাকার উপর দান করিয়াছেন।

পুণ্যশ্লোক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকাণ্ড পুস্তকাগার ছিল। শুনা গেল তাঁহার অনেক ঋণ, সেই ঋণের দায়ে ঐ বৃহৎ পুস্তকাগারখানা বিক্রয় করিয়া ফেলা হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু যত্নে, বহু অর্থব্যয়ে কতশত পুস্তক সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পুস্তকাগারে সঞ্চিত করিয়াছিলেন। ঋণের দায়ে সেই বহুমূল্য পুস্তকাগার আজ নিলামে চড়িতে যাইতেছে। রামেন্দ্রসুন্দর দেখিলেন যার প্রচুর অর্থ আছে সেই উহা কিনিয়া লইবে, কোথায় কার কাছে গিয়া পড়িবে তাই বা কে জানে। মহাপুরুষের এমন একটা অক্ষয় কীর্ত্তি—অমূল্য স্মৃতিচিহ্ন সর্ব্বসাধারণে হয়তো আর দেখিতেই পাইবে না। তাই তিনি ঠিক করিলেন পরিষদের পুস্তকাগারের সহিত ঐ পুস্তকাগার আনিয়া সংযুক্ত করিয়া রাখিবেন। লালগোলার রাজা বাহাদুরকে তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

বদান্যবর রাজা বাহাদুর মুক্তহস্ত বিদ্যোৎসাহী। তাঁহারই অর্থসাহায্যে 'বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী' পরিষদের হস্তে আসিল—মহাপণ্ডিতের অমূল্য রত্ন সযত্নে সংরক্ষিত হইল। ১৩১৭ সালে উহা পরিষদ্-মন্দিরে সংস্থাপিত হইয়াছে।

১৩১৬ সালে ত্রিবেদী মহাশয়ের যত্নে পরিষদের চিত্রশালা (Museum) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই চিত্রশালাতে বহু প্রাচীন চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে। এখানে পুরাবৃত্তের বহু উপকরণ সংগৃহীত ও সুরক্ষিত হইয়া বাঙ্গালীর প্রাচীন কীর্ত্তিকাহিনীর পরিচয় সভ্যজগতের নিকট প্রদান করিতেছে।

বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি সাধন কল্পে চেষ্টা ও সফলতা পরিষদের অক্ষয় কীর্ত্তি। পরিষদের চেষ্টায়ই আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্ এ পরীক্ষায়ও বাঙ্গলা ভাষা স্থান পাইয়াছে। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বেও বাঙ্গলা ভাষার এ সম্মান ও সমাদর ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয় মনে করিতেন বাঙ্গলা সাহিত্যে কোন উচ্চশিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না, বাঙ্গলা সাহিত্যে যে আবার শিক্ষার বিষয় কিছু থাকিতে পারে সেই ধারণাই অনেকের ছিল না। সাহিত্য পরিষদের পুনঃ পুনঃ আবেদন ও চেষ্টার ফলে আজ প্রবেশিকা হইতে আরম্ভ করিয়া এম্ এ পরীক্ষাতে পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সাহিত্য স্থান পাইয়াছে। বাঙ্গলা ভাষাকে এতদিন পর্য্যন্ত সকলেই উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন কিন্তু আর সে উপায় নাই। এখন আশা করা যায় যে এমন একদিন আসিবে—বাঙ্গলা সাহিত্যের এমন উন্নতি হইবে যে উচ্চশিক্ষার সকল বিষয়ই বাঙ্গলাতে শিক্ষা দেওয়া হইবে—বিদেশী ভাষার সকল গ্রন্থই মাতৃভাষায় অনূদিত হইয়া মাতৃভাষাতেই অধ্যাপিত হইবে—পরীক্ষা গ্রহণ শুধু মাতৃভাষাতেই সম্পাদিত হইবে।

সাহিত্য সম্মিলনের গোড়ার ইতিহাসে রামেন্দ্রসুন্দরের নাম জড়িত রহিয়াছে। বহুদিন হইতেই বাঙ্গলার সাহিত্যসেবক-বৃন্দের মনে

একটা মিলনের আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল কিন্তু উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাবে সে মিলন সাধিত হইতেছিল না। রামেন্দ্রসুন্দর দেখিলেন—এটা দল বাঁধিবার যুগ। এ যুগে দল না বাঁধিয়া কাজ করিলে দেশের এবং দশের কাজ করা একেবারে অসম্ভব। দেশে রাজনৈতিকের দল রহিয়াছে, সমাজ সংস্কারকের দল রহিয়াছে, হিন্দুধর্ম্মোন্নতির জন্য ধর্ম্মমহামণ্ডল রহিয়াছে কিন্তু সাহিত্য-সাধনার জন্য ত কোন দল এ দেশে নাই। তাই তিনি ঠিক করিলেন বাঙ্গলাদেশের সাহিত্য-সেবীদিগকে লইয়া একটা দল বাঁধিতে হইবে। দল না বাঁধিলে, সঙ্ঘ স্থাপিত না করিলে এবং সকলে মিলিত হইতে না পারিলে পরস্পরের ভিতর ভাবের আদান প্রদান চলিতে পারে না। বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্য-সেবকদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করা, প্রত্যেকের ভিতর সাহিত্য-প্রীতি জাগাইয়া তোলা এবং নূতন নূতন সাহিত্য-সেবক সৃষ্টি করা প্রয়োজন। তাই তিনি এই মিলন সাধনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। তাঁহারই অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে এবং সমস্ত কার্য্য পরিচালন-ভার নিজ হাতে গ্রহণ করিলে তাঁহার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইল।

বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে রামেন্দ্রসুন্দরের নাম চিরস্মরণীয়—, সেই ইতিহাসে ১৩১৪ সালও একটী স্মরণীয় বৎসর। সেই সালে উদার-হৃদয় দানবীর মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের উদ্যোগে কাশীম-বাজারে সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়। কবিসম্রাট্ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সময়ে সময়ে এই অধিবেশন হইতেছে। ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, হাবড়া, চট্টগ্রাম প্রভৃতি সহরে বিপুল আয়োজনে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

আজকাল বাঙ্গলা ভাষাটাকে সংস্কৃতের হাত হইতে একেবারে মুক্ত করিয়া খাঁটি বাঙ্গলা লিখিতে অনেকেই চেষ্টা করিতেছেন। রামেন্দ্র-

সুন্দরও এই খাঁটি বাঙ্গলা লিখিবার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার কথাই এখানে তুলিয়া দিতেছি। "আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাষা হইতে সংস্কৃত শব্দের নির্ব্বাসনের যাঁহারা পক্ষপাতী তাঁহাদিগকে নজীর সংগ্রহের জন্য অন্যত্র যাইতে হইবে না। মহারাজ আদিশূর বঙ্গদেশে বৈদিকপন্থা প্রবর্ত্তনের জন্য যে সকল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরদের নামকরণেই এই নজীর মিলিবে। শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ভট্টনারায়ণের পাঁচপুরুষ পরে যে বংশধরগণ বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহাদের নাম আউ আর গাউ; কাশ্যপ-গোত্রীয় দক্ষের পঞ্চম পুরুষগণের নাম হারো আর নারো; ভরদ্বাজ-গোত্রজ শ্রীহর্ষের পঞ্চম পুরুষ আবর আর পাবর, আর সাবর। সে কালের আদর্শ রাজার নাম লাউসেন, রাজমহিষীদের নাম উডুনা আর পুডুনা; শ্রেষ্ঠী বণিকের পত্নীদের নাম খুল্লনা আর লহনা।" এই যে নজীর তিনি বাঙ্গালীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন তাহা ত বাঙ্গলা-সাহিত্য হইতেই। প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্য হইতেই আমরা সেকালের বাঙ্গালীর মনের কথা, তাহার সুখ দুঃখ, হাসি কান্নার কথা, তাহার আশা আকাঙ্ক্ষার কথা, স্বপ্নরাজ্যের কথা, পরীরাজ্যের কথা সকলি জানিতে পাই। এই বাঙ্গলা ভাষাতেই চণ্ডীদাস মধুর সুধার ধারা ঢালিয়া সাহিত্যকে আর্দ্র করিয়াছেন, এই ভাষাতেই কাশীরাম দাস অমৃতসমান মহাভারতের কথা শুনাইয়াছেন, সাধক রামপ্রসাদ এই ভাষাতেই ভক্তিরসে মায়ের চরণ বন্দনা করিয়াছেন। রামেন্দ্রসুন্দরও আজীবন এই ভাষা-জননীর অর্চ্চনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন—"এই পতিত জাতির যদি উদ্ধার সাধন হয়, তাহা সাহিত্যের বলেই হইবে, একথা ধ্রুব সত্য।"

সাহিত্য সাধনার জন্যই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দির প্রতিষ্ঠা; সাহিত্যের উন্নতি, সাহিত্যসেবকের সৃষ্টির জন্যই সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠান। রামেন্দ্রসুন্দরের আরো একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল—'সারস্বত

ভবন' প্রতিষ্ঠা করা। তাঁহার ইচ্ছা ছিল ঐ মন্দিরের এক পার্শ্বে একটী পুস্তকালয় থাকিবে, সেখানে বাঙ্গলা ভাষায় লেখা মুদ্রিত-অমুদ্রিত গ্রন্থ ও বঙ্গের নানা স্থান হইতে হাতে লেখা প্রাচীন পুঁথি সকল সংগৃহীত হইবে। অন্যস্থানে বঙ্গের সাহিত্যিকগণের স্মৃতিচিহ্ন রক্ষিত হইবে। আর এক স্থানে বাঙ্গলার পুরাতত্ত্বের উপাদানসমূহ সংগৃহীত হইবে। অপর স্থানে থাকিবে বাঙ্গলার কর্ম্মবীরদের স্মৃতিচিহ্ন—'প্রতাপাদিত্য 'ও সীতারাম হইতে রামগোপাল ঘোষ ও কৃষ্ণদাস পাল পর্য্যন্ত সকলেরই কোন না কোন নিদর্শন দেখিয়া আমরা পুলকিত হইব।' সেখানে সেই 'সারস্বত ভবনে কোন কিছুকেই বাদ দিলে চলিবে না—নানা দ্রব্যসম্ভারে এমন একটী কলা-ভবন গড়িয়া তুলিতে হইবে, যে দেশী বিদেশী যে কেহ সেখানে প্রবেশ করিয়া 'বাঙ্গালার ফলফুল, লতাপাতা, গাছপালা, জীবজন্তু, শিল্প-সম্ভারের নমুনা দেখিয়া বঙ্গভূমিকে অতি সহজেই বুঝিয়া চিনিয়া লইতে পারিবে।' রামেন্দ্রসুন্দরের ইহাই কল্পিত মাতৃমন্দির, উহার ভিতরে সংগৃহীত দ্রব্য-সম্ভারই তাঁহার মাতৃপ্রতিমা। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে আজ পর্য্যন্তও তাঁহার পরিকল্পিত সেই মাতৃমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইল না।

সাহিত্য পরিষদের তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন, পরিষদ্‌কে তিনি যে কি রকম ভালবাসিতেন তাহা বলা যায় না। পরিষদের জন্য তিনি যেন প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। অনেকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন—'পরিষদের কেরানীগিরি করিয়াই রামেন্দ্র মরিল'! অনেকের ধারণা ছিল যে রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্যের আলোচনা না করিয়া যদি বিজ্ঞান চর্চ্চা করিতেন তবে দেশের উপকার আরো বেশী হইত। কিন্তু বিজ্ঞানাগারে আজীবন গবেষণা না করিয়াও তিনি যে সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য অমৃতসরস ভাষায় লিখিয়া বাঙ্গালীকে দান করিয়া গিয়াছেন, তেমন ত আর কেহ দিতে পারে নাই। বিজ্ঞানাগারে অনুসন্ধানে রত থাকিলে তিনি বিজ্ঞান জগতে

অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু তাঁহার বহুমুখী প্রতিভাকে বৈজ্ঞানিকের ল্যাবোরেটরীতে আবদ্ধ না রাখিয়া তাহা দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পরিচর্য্যায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে দেশের উন্নতি যদি করিতে হয়, জাতিকে যদি গঠন করিয়া তুলিতে হয় তবে তাহার মাতৃভাষার সাহায্য ভিন্ন হইবে না। তাই তিনি যশের আশা পরিত্যাগ করিয়া, সম্মানের আকাঙ্ক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া, নিরহঙ্কার নিঃস্বার্থপর হইয়া সেই মাতৃভাষা-রূপিণী জননীদেবীর চরণসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দেশভক্তি—চরিত্রবিশ্লেষণ—জীবন-সন্ধ্যা

একদিকে মাতৃভাষা ও অন্যদিকে মাতৃভূমি—ভাষাজননীর সেবা ও জন্মভূমির পূজা—এই ছিল রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনব্যাপী দুইটী প্রধান কাজ। দেশপ্রীতিই তাঁহাকে মাতৃভাষার পূজায় ব্রতী করিয়াছিল। তিনি জানিতেন দেশকে উন্নত করিতে হইলে সেই দেশের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি-সাধনই সকলের আগে করা দরকার। স্বদেশপ্রেম তাঁহার অন্তরে ফল্গুধারার ন্যায় বহমান ছিল। রাজনৈতিক ব্যাপারে তিনি কখনো প্রকাশ্যে যোগদান করিতেন না, কিন্তু নীরবে নির্জ্জনে থাকিয়া দেশের কল্যাণ-কামনায় শুধু কাজই করিয়া গিয়াছেন। এই দেশাত্মবোধ—দেশজননীর প্রতি একান্ত ভক্তির বীজ তাঁহার অন্তরে অতি শৈশবেই উপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার পিতা একজন পরম দেশভক্ত ছিলেন, তাঁহার ন্যায় নির্ভীক এবং উদার-চিত্ত লোক খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। সেই পিতার নিকট রামেন্দ্রসুন্দর অতিশৈশবে স্বদেশকে ভক্তি করিবার শিক্ষা পাইয়াছিলেন। রামেন্দ্র

বাবুর বয়স যখন মাত্র আট বৎসর, সেই সময়ই তাঁহার পিতা তাঁহার অন্তরে স্বদেশ-ভক্তি জাগাইয়া তুলিবার জন্য কত না চেষ্টা করিতেন।

রামেন্দ্র-জীবন দেশভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভিতরে বাহিরে তিনি একজন খাঁটি স্বদেশী ছিলেন। প্রথম প্রথম তিনি চোগা চাপকান পরিয়া কলেজে যাইতেন কিন্তু পরে তাঁহাকে ধুতি-চাদর ভিন্ন অন্য কোন প্রকার বেশ পরিধান করিতে কেহ দেখে নাই। ইংরাজীতে কখনো তিনি কথা বলিতেন না, কলেজে বিজ্ঞানের ক্লাশে পর্য্যন্ত তিনি বাঙ্গলাতেই বক্তৃতা দিতেন কিন্তু ছেলেদিগকে ইংরাজীতে পরীক্ষা দিতে হইবে ভাবিয়া সেই বক্তৃতাই আবার ইংরাজীতে বুঝাইয়া দিতেন। পারিতে কখনো তিনি বাঙ্গলা ছাড়া ইংরাজীতে চিঠি পত্র লিখিতেন না। তাঁহার সমস্ত প্রবন্ধ ও পুস্তকগুলি বাঙ্গালাতেই লেখা।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি নীরবে শুধু চিন্তা ও দেশের কল্যাণকামনা করিয়াছেন। সভা সমিতিতে যোগদান করা কিম্বা খুব হৈ চৈ করা তাঁহার স্বভাব ছিল না। ঢাক ঢোল পিটাইয়া দেশ ভক্তি জাহির করিতে তিনি কখনো যান নাই। তিনি কাজের মধ্যে করিয়াছেন এই—'প্রবাসী' মাসিক পত্রিকাতে কয়েকটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং বাঙ্গলাদেশে ৩০ শে আশ্বিন 'অরন্ধন' প্রথা সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সময়ই শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্ররোচনায় 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' লিখিয়াছিলেন। স্বদেশপ্রীতি এবং সাহিত্য হিসাবেও উহা একটী বহুমূল্য রত্ন স্বরূপ। এখানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"বন্দেমাতরম্। বাংলা নামে দেশ, তার উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা মর্ত্ত্যে নেমে নিজের মাটিতে সেই দেশ গড়্লেন। প্রয়াগ, কাশী পার হয়ে, মা পূর্ব্ববাহিনী হয়ে সেই দেশে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে মা সেখানে শতমুখী হলেন, শতমুখী হয়ে মা সাগরে মিশ্লেন, তখন লক্ষ্মী এসে সেই শতমুখে অধিষ্ঠান কর্লেন, বাংলার লক্ষ্মী বাংলা দেশ

জুড়ে বস্‌লেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ কর্‌তে লাগ্‌লেন। ফলে ফুলে দেশ আলো হল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠ্‌ল। তাতে রাজহংস খেলা কর্‌তে লাগ্‌ল। লোকের গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, গালভরা হাসি। লোকে পরমসুখে বাস করতে লাগ্‌ল।

মা লক্ষ্মী, কৃপা কর, কাঞ্চন দিয়ে কাচ নেবো না। ঘরের থাক্‌তে পরের নেবো না। শাঁখা থাক্‌তে চুড়ি পর্‌বো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা কর্‌বো না। মোটা অন্ন ভোজন কর্‌বো। মোটা বসন অঙ্গে নেবো। মোটা ভূষণ আভরণ কর্‌বো। পড়শীকে খাইয়ে নিজে খাব। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক্‌, মোটা বস্ত্র অক্ষয় হোক্‌। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুক ; বাংলার লক্ষ্মী বাংলায় থাকুন।"

কি মিষ্টি, কি সরল এই কথা গুলি। ইহার প্রত্যেকটি কথায় স্বদেশপ্রীতি যেন উথলিয়া পড়িতেছে। রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গলার রমণীদিগকেও স্বদেশের কাজে ব্রতী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ছোট বেলা হইতেই বাঙ্গালীর ছোট ছোট মেয়েদের প্রাণে দেশভক্তি জাগাইয়া তুলিবার জন্যই এই 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' এমন সরল, এমন সহজ মিষ্টি ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন।

দেশের দুঃখে তাঁহার প্রাণ সত্য সত্যই কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। দেশের দুঃখ মোচন করিবার জন্য তিনি নিজের সুখ সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন না। যে বার শ্রীমতী আনি বেসাণ্ট মহোদয়ার সভানেত্রী লইয়া ভারতসভায় বাক্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হয় তখন রামেন্দ্রসুন্দর পীড়িত ছিলেন ; কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা তাঁহাকে এই রাজনৈতিক সমস্যার সময় শয্যায় আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না। তিনি লোকমতকে জয়যুক্ত করিবার জন্য ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া সেই সভায় উপস্থিত হইলেন এবং আনি বেসাণ্টকে ভোট দিয়া আসিলেন।

পাশ্চাত্যশিক্ষিত হইয়াও তিনি মাতৃভূমিকে ভুলিয়া যান নাই—

স্বদেশের প্রতি ভক্তি তাঁহার অকৃত্রিম ছিল, প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার উপর তাঁহার অটুট শ্রদ্ধা ছিল। ইংরাজীতে কথা বলিতেন না এবং ইংরাজী ভাষায় কিছু লিখিতেন না বলিয়া তিনি যে উহা ঘৃণা বা অবহেলা করিতেন তা নয়, পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলেই যে ভারতবর্ষের উন্নতি হইয়াছে তাহা তিনি স্বীকার করিতেন। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষও তিনি অতি সুন্দর ভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। প্রাচীন কালে আমাদের দেশে শিক্ষার্থীগণ গুরুগৃহে যাইয়া গুরুর পদপ্রান্তে বসিয়া, গুরুর সঙ্গে একত্রে আহার বিহার করিয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক উপায়ে শিক্ষা গ্রহণ করিত। তখনকার শিক্ষা ছিল আত্মোন্নতির শিক্ষা, প্রকৃত মানুষ গড়িবার শিক্ষা, আর আজকালকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা হইয়াছে অর্থোপার্জ্জনের শিক্ষা, আত্মপ্রতিষ্ঠার শিক্ষা। এই জন্য তিনি এই পাশ্চাত্য-শিক্ষা-প্রণালীকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিতে পারেন নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের জন্য এক 'কমিশন' বসিয়াছিল—তাহার নাম 'স্যাড্‌লার কমিশন'। রামেন্দ্রসুন্দর ঐ কমিশনের একজন সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন তাহা যেমনি যুক্তিপূর্ণ ছিল তেমনি স্বদেশপ্রীতিতে ভরপূর ছিল। তিনি তাহাতে বলিয়াছেন যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ বিদেশী জিনিষ। এই বিলাতী শিক্ষা যখন আমাদের দেশে আমদানী করা হয় তখন দেশের অত্যন্ত দুরবস্থা। বিপদে পড়িলে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। যে স্রোতে পড়িয়াছে সে সম্মুখের তৃণখণ্ডকেও আশ্রয় জ্ঞানে আঁকড়িয়া ধরে। আমাদের দেশের অবস্থা তখন ঠিক এইরূপ ছিল। লোকে তখন শিক্ষা চাহিয়াছিল এবং এই পাশ্চাত্য শিক্ষাকে সম্মুখে পাইয়া তাহাই সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছিল। এই শিক্ষার ফলে আমরা কি পাইয়াছি? আমাদের ইতিহাস ও ভূগোলের জ্ঞান গণ্ডীবদ্ধ সঙ্কীর্ণ ছিল—সেই সঙ্কীর্ণতা দোষ এই পাশ্চাত্য শিক্ষায় দূর করিয়া দিয়াছে, আমাদের জাতীয় জীবন গঠন করিবার পথ দেখাইয়া দিয়াছে, জীবনসংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য

আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। উপকার যথেষ্ট হইয়াছে তাহাতে ভুল নাই কিন্তু বিনিময়ে আমরা যাহা দিয়াছি তাহার মূল্য যে আরো অনেক বেশী। এই শিক্ষার নিকট আমরা বলি দিয়াছি আমাদের প্রাচীন শিক্ষা-প্রণালী—বিসর্জন দিয়াছি আত্মসম্মানজ্ঞান—হারাইয়াছি আমাদের পরস্পরের প্রতি ভক্তি ও সহানুভূতি—বিনষ্ট করিয়াছি জীবনের গৌরব ও মহত্ত্ব। যাহা গিয়াছে তাহা পুনরুদ্ধার করিতে গেলে চাই সংযম, চাই সাধনা, চাই অকৃত্রিম দেশানুরাগ। রামেন্দ্রসুন্দরে এ সবই ছিল—তিনি ছিলেন ভাবী শিক্ষিত বাঙ্গালীর আদর্শপুরুষ।

তিনি বলিয়াছেন—বিদেশী শিক্ষাকে 'বয়কট্' করিলে চলিবে না। যে দেশে যা'র কাছে যা'কিছু শিখিবার আছে তাই আমাদিগকে শিখিতে হইবে, ভাল যা'কিছু যেখানেই আমরা দেখিতে পাইব তাহাই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। মৌমাছি যেমন করিয়া নানা ফুল হইতে মধু আহরণ করিয়া মধুচক্র গড়িয়া তোলে, আমাদিগকেও ঠিক সেইরূপ করিতে হইবে। সকল দেশ এবং সকল জাতির নিকট হইতেই শিক্ষণীয় বিষয়-গুলি আয়ত্ত করিয়া দেশবাসীকে তাহার সারাংশ বিলাইয়া দিতে হইবে। রামেন্দ্রসুন্দরও ঠিক তাই করিয়াছিলেন, আধুনিক ইয়োরোপীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্য হইতে তিনি জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া দেশবাসীকে তার অমৃতটুকুই দান করিয়া গিয়াছেন।

কলেজের ছাত্রদিগকে তিনি কখনো তিরস্কার করিতেন না। যে অন্যায় করিত তাহাকে অনুযোগ দিতেন, উপদেশ দিতেন এবং এই কথাটুকু তাহাকে জানাইয়া দিতেন যে, মনে রাখিও তুমি ভারতের ছাত্র—তোমার আচরণের উপরই ভারতের সুখ্যাতি অখ্যাতি নির্ভর করিতেছে।

তাঁহার চরিত্রের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই বলিতে হয় তাঁহার নামটী যেমন রামেন্দ্রসুন্দর, সবই ছিল তাঁর তেমনি সুন্দর। তাঁর কথা—

সুন্দর, তাঁর ব্যবহার—সুন্দর, তাঁর পাণ্ডিত্য—সুন্দর তাঁর রচনা—সুন্দর, তাঁর স্বদেশ-প্রীতি, তাঁর সাহিত্য-সাধনা, তাঁর সরলতা, তাঁর মহানুভবতা—সবই সুন্দর!

তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে সাহিত্য পরিষৎ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়ার কথা হয়। তাহাতে তিনি অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলে অনেকেই মনে করিল তিনি বুঝি খুব সম্মান-লিপ্সু; কিন্তু পরে জানা গেল তা ত নয়—'বাপ পিতামহের চেয়ে অনেক দিন বাঁচিয়া আছি'—ইহাই তাঁহার আনন্দের কারণ। পরিষদের পক্ষ হইতে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রামেন্দ্রসুন্দরকে যে অভিনন্দন দিয়াছিলেন, তাহা যেমনি সুন্দর তেমনি মধুর—তাহাতে রামেন্দ্র-চরিত্রের সমস্ত গুণ-রাশিই উল্লেখ আছে। নিম্নে সেই অভিনন্দন-পত্র উদ্ধৃত করা হইল :—

"সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী,

হে মিত্র, পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ণ করিয়া তুমি তোমার জীবনের ও বঙ্গ সাহিত্যের মধ্যগগনে আরোহণ করিয়াছ—আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

যখন নবীন ছিলে তখনই তোমার ললাটে জ্ঞানের শুভ্রমুকুট পরাইয়া বিধাতা তোমাকে বিদ্বৎসমাজে প্রবীণের অধিকার দান করিয়াছিলেন। আজ তুমি যশে ও বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু তোমার হৃদয়ের মধ্যে নবীনতার অমৃতরস চিরসঞ্চিত। অন্তরে তুমি অজর, কীর্ত্তিতে তুমি অমর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সর্ব্বজনপ্রিয় তুমি মাধুর্য্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

পূর্ব্বদিগন্তে তোমার প্রতিভার রশ্মিচ্ছটা স্বদেশের নবপ্রভাতে

উদ্বোধন সঞ্চার করিতেছে। জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যে চিরদিন তুমি দেশমাতার পূজা করিয়াছ। হে মাতৃভূমির প্রিয়পুত্র, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সাহিত্য-পরিষদের সারথি তুমি এই রথটিকে নিরন্তর বিজয়পথে চালনা করিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কার্য্যে তুমি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিয়াছ, ক্ষমার দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ, বীর্য্যের দ্বারা অবসাদকে দূর করিয়াছ এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ। আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে
নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে

প্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রিয় তুমি তোমাকে আহ্বান করি, নিধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধি তুমি তোমাকে আহ্বান করি। তোমাকে দীর্ঘজীবনে আহ্বান করি, দেশের কল্যাণে আহ্বান করি, বন্ধুজনের হৃদয়াসনে আহ্বান করি।

৫ই ভাদ্র, ১৩২১। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

রামেন্দ্রসুন্দরের সবই সুন্দর ছিল সত্য কিন্তু অসুন্দর ছিল তাঁর হাতের লেখা। তাঁহার লেখা পড়িতে গলদ্‌ঘর্ম্ম উপস্থিত হইত। একবার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন রায় সাহেব মহাশয় রামেন্দ্রসুন্দরের হাতের লেখার উপর বিরক্ত হইয়া একখানা পোষ্টকার্ড তাঁহার নামে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে হিজিবিজি কয়েকটা আঁচড় কাটা ছিল এবং মাঝে মাঝে দুএকটা বাংলা শব্দ বসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল—কোন কাজের কথাই তাহাতে ছিল না। সেই পোষ্টকার্ড পাইয়া পরদিন প্রাতে তিনি গাড়ী করিয়া দীনেশ বাবুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত। অত্যন্ত বিরক্তির স্বরে তিনি দীনেশ বাবুকে বলিলেন—'কি যে মাথামুণ্ডু লিখিয়াছেন, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কাজ ফেলিয়াও চলিয়া আসিয়াছি।' দীনেশ বাবু ত অপ্রস্তুত। তিনি বলিলেন—"কোন কাজের কথা ত লিখি নাই, আপনার লেখা যে

রকম খারাপ, আপনার চিঠি পত্র পড়িতে আমাদের কি রকম কষ্ট হয় তাহাই বুঝাইয়া দিবার জন্য ঐ পোষ্টকার্ড পাঠাইয়াছিলাম।' রামেন্দ্রসুন্দর তখন চুপ করিয়া গম্ভীরভাবে কতকক্ষণ বসিয়া রহিলেন; তারপর তাঁহার মুখে সেই হাসি ফুটিয়া উঠিল—নির্ম্মল, সরল, উদার; পৃথিবীতে সে হাসির উপমা মিলে না—সে হাসিতে স্বর্গের সুবাস মাখান ছিল।

রামেন্দ্রসুন্দর গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা-দীপ্ত উজ্জ্বল চোখ দুটিতে গাম্ভীর্য্য মাখান ছিল। তাঁহার ন্যায় নির্ভীক, নিঃস্বার্থপর, পরহিতকারী কোমলহৃদয় ব্যক্তি খুব অল্পই দৃষ্ট হয়। তিনি ছাত্রদের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া আনন্দের সহিত যোগদান করিতেন। ছাত্রেরা যখন খেলায় জিতিয়া তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইত, তখন তিনি তাহা-দিগকে প্রচুর মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া দিতেন। পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। এমন আড়ম্বরশূন্য শান্তিপ্রিয় লোক বর্ত্তমান-কালে প্রায় দেখা যায় না।

শ্রীযুক্ত আর কিমুরা একজন জাপানদেশের লোক। বাঙ্গলা ভাষা শিখিতে তিনি ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। প্রায় নয় বৎসর পূর্ব্বে তিনি প্রথম কলিকাতা আসিয়া বাঙ্গলা শিখিতে আরম্ভ করেন। সেই সময়েই রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে তাঁহার আলাপ ও পরিচয় হয়। রামেন্দ্র-সুন্দর তাঁহার শিক্ষাদাতা এবং শান্তিদাতা স্বরূপ ছিলেন। কিমুরা সাহেবের নিজের লেখাই এখানে খানিকটা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"সেবার আমার বড় অসুখ হইয়াছিল। দীর্ঘকাল ভুগিয়াছিলাম বলিয়া নিজের কোনও কাজ করিতে পারিতাম না। কাজ করিতে না পারায় এমনই কষ্ট বোধ হইত যে, একা থাকিতে খুব অশান্তি ভোগ করিতাম। সেই জন্য সেবার কিছুদিন প্রায় প্রত্যহ উঁহার (রামেন্দ্র-সুন্দরের) কাছে গিয়া বসিতাম। একদিন তিনি বলিলেন,—'কি কিমুরা সাহেব, আসুন, কোনও কাজ আছে?' বড়ই অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম।

বাস্তবিকই ত কোনও কাজ নাই—কেন প্রত্যহ উঁহাকে বিরক্ত করিতে আসি? কি আর উত্তর দিব, বলিলাম—'কোনও কাজ ত নাই—আপনাকে দেখ্‌তে এসেছি।'—'বেশ—আসুন। কাজ না থাক্‌লে এখানে কি করিতেন?' 'অসুখের জন্য কাজ কর্‌তে না পারায় বড় চঞ্চল হয়ে পড়েছি, আপনার কাছে একটু শান্তিলাভ করিতে এসেছি।' রামেন্দ্রসুন্দর বড় আনন্দিত হইয়া বলিলেন—'এখানে আসিলে কি আপনার শান্তি হয়?' 'হাঁ, আপনার শান্ত হাসিমুখ দেখিলে হৃদয়ে বড় শান্তি পাই।' আনন্দোচ্ছ্বাসে তাঁর চ'খে সেদিন জল আসিয়াছিল, আমার বেশ মনে আছে—আর তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না, বলিয়াছিলেন—'কিমুরা মহাশয়—আমাদের দেশ দরিদ্র হইলেও সেই শান্তি ভাবটা এখনও রহিয়াছে।' বাস্তবিক কথা বলিতে গেলেও তাই। প্রাচীন ভারতের স্মৃতিচিহ্ন ঐ রকম দুই একটা ভাবের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়।"

রামেন্দ্রসুন্দরের চরিত্র ছিল আদর্শ চরিত্র। একদিকে তিনি যেমন বজ্রাদপি কঠোর ছিলেন, অন্যদিকে তিনি তেমনি কুসুমের চেয়েও মৃদু কোমল ছিলেন। তাঁহার শিক্ষার প্রণালীও ছিল আদর্শস্থল। তিনি নিজে যে ভাবে পাঠ শিক্ষা করিতেন তাহাও ছিল অত্যন্ত সুন্দর। যা কিছু পড়িতেন তাহাই তিনি খাতায় লিখিয়া পরে পুস্তকের সঙ্গে মিলাইয়া লইতেন।

তাঁহার দেহে বল ছিল না কিন্তু মনের জোর অত্যন্ত বেশী ছিল। তিনি একজন খাঁটি, দৃঢ়চিত্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় এমন অক্লান্ত-

পরিশ্রমী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, আত্মত্যাগী, নিরভিমানী এবং বিনয়ী লোক যে দেশে জন্মগ্রহণ করে, সে দেশ, সে জাতি ধন্য হয়। রামেন্দ্রসুন্দর জ্ঞানগরিষ্ঠ পণ্ডিত হইয়াও কি রকম বিনয়-নম্র ছিলেন তাহা একটী ঘটনাতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। তাঁহাকে পরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইলে তিনি লিখিয়াছিলেন—"আমি চিরজীবন পরিষদের সেবকের কার্য্য করিয়া যাইব, ইহাই আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা—পরিষদের নেতৃত্ব গ্রহণ আমার কাজ নহে। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি আমার এই চির-পোষিত আকাঙ্ক্ষায় বাধা দিবেন কি ?"

১৩১৯ সালে রামেন্দ্রসুন্দর পুরী গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার মস্তিষ্কের পীড়া হয়। ১৩২৫ সালে তিনি ব্রাইট পীড়ায় আক্রান্ত হন। তাঁহার কলিক্ বেদনাও হইয়াছিল। সেবার পুরী যাইয়া যে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, সেই ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়াই তাঁহার বাকী জীবন কাটিয়াছিল। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৫৫ বৎসর।

মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার শোথ ও উদরী হইয়াছিল—এই রোগই তাঁহার অন্তিমরোগ। বহু চিকিৎসা করাইয়াও তিনি আর আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শেষ কথা

মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই রামেন্দ্রসুন্দরের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। লেখার অভ্যাসও কমিয়া গিয়াছিল। তিনি তখন লিখিতে পারিতেন

না, তাই প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া তাঁহার মুখ হইতে নূতন নূতন তথ্য সকল বাহির করিয়া লওয়া হইত। তিনি তখন বলিতেন—"দেখুন, যখন শরীর ভাল ছিল, তখন ভাবতাম, সব কথাই বলা হয়ে গেছে, কেউ না কেউ বলে ফেলেছে। এখন এই বিছানায় শুয়ে শুয়ে মনে হচ্ছে, আমিও কিছু নতুন কথা বল্‌তে পার্‌তাম। অনেক পড়েছি ও ভেবেছি, কিন্তু এখন কেন মনে হচ্চে, কতকগুলো ইতিহাসের ও দর্শনের সমস্যার নতুন ব্যাখ্যা দিতে পারি। তাই যেন একটু আপ্‌শোষ হয়।" এই সময়ই রুগ্ন-শয্যায় থাকিয়া তিনি যে সব নূতন কথা শুনাইয়াছেন তাহাই "বিচিত্র প্রসঙ্গে" লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।

তাঁহার দুই কন্যা ও এক পুত্র। পুত্রটী একবৎসর বয়সেই মারা যায়। কান্দী-বাগডাঙ্গা নিবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রগোপাল রায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী চঞ্চলা দেবীর বিবাহ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রগোপালের তিনটী কন্যা ও তিনটী পুত্র। যশোহর শানটানিবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী গিরিজা দেবীর বিবাহ হয়। শ্রীযুক্ত শীতল চন্দ্রের চারিটী কন্যা ও দুইটী পুত্র। ১৩২৫ সালের আশ্বিন মাসে তাঁহার ব্রাইট পীড়া হয়। পৌষ মাসে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার মৃত্যু হয়, চৈত্র মাসের সংক্রান্তিদিন তাঁহার মাতা পরলোক গমন করেন। উপর্য্যুপরি এই কতকগুলি শোকের আঘাত পাইয়া তাঁহার পীড়া ক্রমশঃ বাড়িয়া চলে। তিনি এই পীড়া লইয়াই মাতৃশ্রাদ্ধ করিতে জেমোয় যান। উপবাস, অনিয়ম ও যাতায়াতের কষ্টে তাঁহার পীড়া সাংঘাতিক হইয়া উঠে। তাঁহাকে

সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় কলিকাতা লইয়া আসা হয়। এই সময় তিনি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আচ্ছা ডাক্তার, বল দেখি, এই ব্যারামের মধ্যে যখন সমস্ত দেহ-যন্ত্র ব্যাধিগ্রস্ত ও অবসন্ন, তখন মাথাটা এত পরিষ্কার হয় কেন?" তাঁহার অসুখের সময় 'বিচিত্র প্রসঙ্গের' কথাগুলি কেমন করিয়া যে তাঁহার মুখদিয়া বাহির হইয়াছিল তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

রামেন্দ্রসুন্দর যখন রোগশয্যায় শয়ান ছিলেন তখন স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয় তাঁহার সহিত দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া চিঠি লিখেন এবং কোন্ সময়ে গেলে দেখা হইতে পারে তাহা জানিতে চাহেন। রামেন্দ্রসুন্দর ইচ্ছা করিলে গাড়ীতে বা পাল্কীতে সিনেট হলে গিয়াও স্যর আশুতোষ সহ দেখা করিয়া আসিতে পারিতেন কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া অতি বিনীতভাবে স্যর আশুতোষকে আসিতে চিঠি লিখেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্যর আশুতোষ রামেন্দ্রসুন্দরের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিয়া বলেন "আমি অসুস্থ হইলেও কষ্টে ইউনিভার্শিটীতে গিয়া আপনার সহিত দেখা করিতে পারিতাম; কিন্তু আপনি আমার বাটীতে আসিয়া পদধূলি দিবেন, এই লোভ সংবরণ করিতে পারি নাই। এই জন্যই আপনাকে আসিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলাম।" সে সময় রামেন্দ্রসুন্দরের জ্বর আসিয়াছিল কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি উৎফুল্ল মনে স্যর আশুতোষ সহ বহু আলোচনা করেন।

রামেন্দ্রসুন্দর, কবিবর রবীন্দ্রনাথের একজন পরম ভক্ত এবং

গুণগ্রাহী ছিলেন। রবিবাবুর 'মৃত্যুর পরে' কবিতাটি পড়িতে পড়িতে তিনি এমন মুগ্ধ ও বিচলিত হইয়া পড়িতেন যে কিছুতেই আর আত্মসংবরণ করিতে পারিতেন না—তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিত। রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' পাঠ করিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহার 'অচলায়তন' পড়িয়াও রামেন্দ্রসুন্দর মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—'ইহার একটা জবাব দিতে হবে।' কিন্তু রবিবাবু ছিলেন তাঁহার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। বন্ধুর সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত করা সঙ্গত নয় মনে করিয়াই বোধ হয় তিনি প্রকাশ্যে কোন আন্দোলনই উপস্থিত করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ "নাইট" উপাধি বর্জ্জন করেন। সেই উপাধি ত্যাগ করিয়া গভর্ণমেণ্টকে যে ইংরাজী পত্র লেখেন, তাহার অনুবাদ 'বসুমতী'তে বাহির হয়। সেদিন শনিবার ১৭ই জ্যৈষ্ঠ; মৃত্যুর আর ৭ দিন মাত্র বাকী। তখনো কেহ ভাবিতে পারে নাই যে মৃত্যুর দূত দ্বারের পাশে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে। রামেন্দ্রসুন্দর সেই অনুবাদ-পত্র পড়িয়া তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। রবিবারদিন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বাবুকে রবীন্দ্রনাথের নিকট পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন—"আমি মৃত্যুশয্যায়—উঠিবার শক্তি নাই—আপনার শেষ-দর্শন প্রার্থনা করি—আপনার পায়ের ধূলা চাই।" সোমবার সকালেই রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের রোগশয্যার পাশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামেন্দ্র বাবু তখন রবিবাবুকে তাঁহার উপাধিবর্জ্জনের আসল ইংরাজী চিঠিখানা পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন। কবিবর তাঁহার নিজের লেখা চিঠি নিজের কণ্ঠে পড়িয়া রামেন্দ্রসুন্দরকে শুনাইলেন। কবিকণ্ঠের

সেই সুর তাঁহার কাণের ভিতর যে কি অমৃত ঢালিয়া দিয়াছিল জানি না, সেই ধ্বনি তাঁহার মর্ম্মের তারে কোন্ রাগিণী বাজাইয়া তুলিয়াছিল বলিতে পারি না; কিন্তু সেই যে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, আর চাহিলেন না। সেই শ্রবণই তাঁহার শেষ শ্রবণ—পৃথিবীর কোলাহল আর তাঁহার কাণে প্রবেশ করিতে পারে নাই। স্বদেশ-ভক্ত রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের পদধূলি গ্রহণ করিয়া তন্দ্রাভিভূত হইলেন—সে তন্দ্রা আর ভাঙ্গিল না—সেই তন্দ্রাই রামেন্দ্রজীবনে মহানিদ্রা আনিয়া দিল।

সোমবার দিন তাঁহার জ্ঞান লোপ হয়। সেই একই ভাবে পাঁচ দিন কাটিয়া গেল—নরলোকে তিনি আর চোখ মেলিয়া চাহিলেন না। ১৩২৬ সালের ২৩শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার রাত দশটার সময় স্বভাব-সুন্দর রামেন্দ্রসুন্দর ইহলোকের মায়া কাটাইয়া সেই চিরসুন্দরের দেশে চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু রাখিয়া গিয়াছেন তাঁর অক্ষয় কীর্ত্তি—কাল তাহা নষ্ট করিবে না—ধ্বংস করিবে না। যতদিন বাঙ্গলা সাহিত্য থাকিবে—যতদিন বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ থাকিবে, ততদিন তাঁহার নাম বাঙ্গালী জাতির হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে।

সমাপ্ত।

তিন-আনা সংস্করণ "কল্পতরু" গ্রন্থাবলী

১। বিদ্যাসাগর
২। মাইকেল মধুসূদন
৩। বঙ্কিমচন্দ্র
৪। রাজা রামমোহন রায়
৫। কেশবচন্দ্র
৬। ঠাকুর রামকৃষ্ণ
৭। নেপোলিয়ন
৮। রমেশচন্দ্র দত্ত
৯। রামদুলাল সরকার
১০। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
১১। কৃষ্ণদাস পাল
১২। হাজি মহম্মদ মহসীন
১৩। আনন্দমোহন বসু
১৪। জর্জ্জ ওয়াসিংটন
১৫। প্যারীচরণ সরকার
১৬। লর্ড কিচ্‌নার
১৭। বিবেকানন্দ
১৮। ভূদেব
১৯। জেম্‌সেদ্‌জা টাটা
২০। গোখ্‌লে
২১। দ্বিজেন্দ্রলাল
২২। হেমচন্দ্র
২৩। ডেভিড্ হেয়ার
২৪। রামতনু লাহিড়ী
২৫। লোকমান্য তিলক
২৬। স্যর গুরুদাস
২৭। শিবনাথ শাস্ত্রী
২৮। বিস্‌মার্ক
২৯। গারফিল্ড
৩০। ম্যাটসিনি
৩১। এব্রাহাম লিঙ্কন
৩২। স্যর রাসবিহারী
৩৩। দাদাভাই নৌরজী
৩৪। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর
৩৫। কান্তকবি রজনী
৩৬। বুকার ওয়াসিংটন

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ময়মনসিংহ লাইব্রেরী, ময়মনসিংহ

৯নং পাটুয়াটুলী, ঢাকা।